amarboi.org

বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

boipori.com

সূচনা

আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ বার বার জাতির চারিত্রিক দুগর্তির কথা উল্লেখ করে থাকেন এবং জাতির উন্নতির জন্য চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবিরাম বহুমূল্যবান নসিহত খয়রাত করেন। কিন্তু দু:খের বিষয় তারা প্রায়েই চরিত্রহীন বা সীমাবদ্ধক্ষেত্রে চরিত্রবান, সমাজ থেকেই এর সবক গ্রহণ করে। তারা এমন সব কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন যা বাস্তবক্ষেত্রে চরিত্রের ভিত্তিমূলকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আজ তাই চরিত্র গঠনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক গবেষণার দিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

আরবের বর্বর সমাজের লোকদের মধ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাকে ইতিহাসের বিস্ময় মনে করাই যথেষ্ট নয়। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে মহানবী সে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সে পরিমাণে না হলেও চরিত্র গঠনের ব্যপারে বিপুল সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতিকে উদার উম্মুক্ত মন নিয়ে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে চরিত্রের ধারণা, সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য।

চরিত্রের ধারণায় অরাজকতা

আদর্শের বিভিন্নতার দরুণ চরিত্রের ধারায় স্বাভাবিক ভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এক জাতির নিকট যা চারিত্রিক গুণ বলে পরিচিত অন্য জাতির নিকট তা চরিত্রহীনতা বলে বিবেচিত হতে পারে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণই নেই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলমানদরে মধ্যেই চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধে বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকার ধারণা পাওয়া যায়। প্রধানত: রাসুলের (সা) জীবনাদর্শ সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞানের পার্থক্যের দরুণই চরিত্র সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে যাদের ধারণায় মোটামুটি মিল রয়েছে তাদের মধ্যেও চারিত্রিক গুণাবলীর ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কতক লোক নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় গুণকেও অত্যাবশ্যক মনে করেন। অথচ বহু অপরিহার্য গুণাবলীকেও অনাবশ্যকের তালিকায় স্থান দেন। এক ব্যক্তির চরিত্রের বহু মৌলিক গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও চুল, পোশাক ও দাড়ি ইত্যাদি বিশেষ ধরণের না হওয়ার দরুণ তাকে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত চরিত্রবান মনে করা হয় না। অথচ কতক মৌলিক গুণের অভাব সত্ত্বেও এক ব্যক্তির বাহ্যিক আকারকেই চারিত্রিক উন্নতির অধিকারী বিবেচনা করা হয়। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরজকে ত্যাগ করেও কেউ হয়তো নফল ও মুস্তাহাবের জোরে মহান ও চরিত্রবান বলে পরিচিত হয়।

চরিত্রের ধারণার এসব ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য সম্পর্কে গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, চরিত্র গঠণ পদ্ধতির পার্থক্যই এর প্রধান কারণ। একই রাসুল (সা) কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর আন্তরিকতা সত্ত্বেও চরিত্রের ধারণায় এত পার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক। এ অস্বাভাবিকতা চরিত্র গঠণ পদ্ধতির বিভিন্নতার পরিণাম। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কারো প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করে উদার মনোভাব নিয়ে বিশ্বনবী কর্তৃক গৃহীত চরিত্র গঠণ পদ্ধতির আলোচনা করা প্রয়োজন।

চরিত্র কাকে বলে

চরিত্র কথাটি অত্যন্ত ব্যপক। মানুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্যাবলীই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মুখভঙ্গি থেকেও চরিত্রের ধরণ বুঝা যায়। মানুষ যাবতীয় অংগ প্রত্যংগ দ্বারা প্রকাশেও ও অপ্রকাশ্যে যা কিছু করে এবং ভাবে ও ভঙ্গিতে যা প্রকাশ করে তা সবাই সাধারণ ভাবে চরিত্রের মধ্যে গণ্য। মানুষের সব কাজ ও ভাব ভঙ্গিকে ভাল ও মন্দ হিসাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে। মন্দটুকুকে অসৎ চরিত্রের পরিচায়ক মনে করা হয়। আর ভালটুকুকে সচ্চরিত্র বা চরিত্রের লক্ষণ ধরা হয়। চরিত্রহীন বললে অসচ্চরিত্রই বুঝায়। তাই সাধারণভাবে মানুষের সব কাজ কর্মই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও শুধু গুণবাচক ও প্রশংসাসূচক কাজ ও ভাব ভঙ্গিকেই চরিত্র বলা হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য। অনেক মানুষকে একত্রে বসবাস করতে হলে সবাইকে কতক নিয়ম কানুন মেনে নিতে হয়। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে তাদের ধারণা যেরূপ থাকে তাদের নিয়ম কানুন সেরূপ হয়। যেসব কাজকে তারা ভাল মনে করে সে সবকে সমাজে চালু করা এবং যেগুলোকে তারা মন্দ মনে করে সে সবকে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্যই আইন কানুন, শিক্ষা দিক্ষা, আদালত ফৌজদারী ও শাসন শৃংখলার ব্যবস্থা করা হয়।

ভাল ও মন্দের ধারণার ভিত্তিতে শিশুকাল থেকেই চরিত্র গঠনের প্রয়োজন হয়। কোনকালেই কোন সমাজে চরিত্রগঠনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয় নি। অতীত এবং বর্তমানে চরিত্রের ধারণায় বিভিন্ন সমাজে বিস্তর পার্থক্য পাওয়া গেলেও সব সমাজে নিজ নিজ ধারণা মোতাবেক চরিত্রগঠনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা সমাজে যার যেমন খুশি তেমন ভাবে স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় সবাইকে চলতে দিলে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা অপরিহার্য। ইতিহাসে এমন কোন অসভ্যতম সমাজের সন্ধান পাওয়া যায় না যেখানে চরিত্রের কোন ধারণাই ছিল না। আজও যে সব মানব গোষ্ঠীকে আমরা সভ্য মনে করি তাদেরও চরিত্রবোধ আছে এবং তাদের সে ধারণা অনুযায়ীই তারা চরিত্র গঠন করে।

একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, পারিবারিক নিয়মনীতি থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক যাবতীয় বিধি নিষেধ, স্কুল কলেজ, মক্তব মাদ্রাসা, খানকাহ ও আশ্রম, শাসন ও বিচার, জেল ও জরিমানা এ সবের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রন। সমাজের সবাই যাতে প্রচলিত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং চরিত্রের বিপরীত কাজ থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকে এর জন্য সমাজপতি ও রাষ্ট্র পরিচালকদের চিন্তার অন্ত নাই। অবশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যে ধরণের চরিত্র পছন্দ করে সে ধরণের চরিত্র গঠনের জন্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু চরিত্রের ধরন যাই হোক চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে কারো উপায় নেই। একথাও সত্য যে, চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য যে কোন আইন বা শিক্ষাই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আন্তরিকতা সত্ত্বেও ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতি ও ত্রুটিপূর্ণ আইনের ফলে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের পন্থা ভুল হওয়ার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে, চরিত্রের গুরুত্ব না বুঝার কারণে নয়। মোট কথা চরিত্র গঠনের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করে না।

জাতিগঠনে চরিত্রের স্থান

বর্তমানে প্রায় সব ক'টি মুসলিম দেশেই চরিত্রের ব্যপারে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ চরিত্র সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম জনগণের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই জাতি গঠনের ব্যপারে চরিত্রের উপর যেরূপ গুরুত্ব দেয়া উচিত তা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে মুসলিম জনগণ ভালকাজ ও মন্দ কাজের যে ধারণা পোষণ করে, শাসক গোষ্ঠির ভাল ও মন্দের মাপকাঠি প্রায়ই এর বিপরীত। সরকার ও জনগণের পূর্ণ সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতীত জাতি গঠনের কাজ তরান্বিত হওয়া দুরের কথা, শুরু করাই অসম্ভব। মুসলিম দেশগুলোতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে চরিত্রবোধের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য থাকায় জাতি গঠনের কাজ ব্যপকভাবে ব্যহত হয়ে আছে। যে জাতির নির্ভর যোগ্য চরিত্র সম্পদ নেই সে জাতিকে বিশ্বের সকল দেশও যদি বস্তুসম্পদ খয়রাত করতে থাকে, তবুও উন্নত জাতি হিসাবে দুনিয়ায় সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর যে জাতি চরিত্রের দিক দিয়ে সম্পদশালী তার জাগতিক কোন অভাবই অপূর্ণ থাকবে না। কিন্তু চরিত্রের সম্বল থেকে বঞ্চিত জাতি আর কোন সম্পদ দ্বারাই চরিত্রের অভাব পূরণ করতে পারবে না। তাই বিশ্বের প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্র জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে চরিত্রগঠনকে জাতির পূর্নগঠনের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বদান করে।

চরিত্রের ভিত্তি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কর্মই চরিত্র। সুতরাং কর্মের ভিত্তিই চরিত্রের ভিত্তি। মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের পিছনেই কোন না কোন আভ্যন্তরীন প্রেরনা বিরাজ করে। ভেতরের সে তাগিদই তাকে কর্মের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সে প্রেরণাদানকারী শক্তিরই অপর নাম উদ্দেশ্য। মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজই করে না। উদ্দেশ্য নির্ধারণে ভুল হতে পারে কিন্তু সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন মানুষই উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন কাজ করে না। মানুষ পয়লা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়, এরপর ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কর্মে নিয়োজিত হয়। মানুষ জীবনের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেখানে পৌছার জন্যই সে সর্বপ্রকার চেষ্টা সাধনা করে থাকে। কেননা জীবনের সাফল্য সে লক্ষ্যে পৌছানোর উপরেই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে। কৃতকার্যতা ও সাফল্য লাভের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাব ধর্ম। কিন্তু সাফল্য সম্পর্কে সকলের ধারণা এক নয়।

যার যা উদ্দেশ্য তা লাভ করতে পারলেই সে সফল হয়েছে মনে করে। এ জন্য সবাই নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

এ কথা স্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য চরিত্রের ভিত্তি কিন্তু উদ্দেশ্যের উৎস কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য যদি সবারই একরূপ হতো তাহলে বলা যেতো যে, সহজভাবে মানুষ মাত্রই সে উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়। কিন্তু জীবনের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য আপনা আপনিই স্থির হয়ে যায় না। উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে কতক মৌলিক বিশ্বাসই উৎস হিসাবে কাজ করে। আমার জীবন কি ইহকালেই শেষ, না এ জগতের পরেও কোন জীবন হবে? শুধু এ প্রশ্নটির ভিত্তিতে যে দু'প্রকার বিশ্বাস জন্ম নেয় তাতেই তো জীবনের দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নয় তার জীবনের সাফল্য এ দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ। তার নৈতিকতাবোধ ও মূল্যমান পার্থিব জীবনে সাফল্য লাভের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ায় সাফল্যময় জীবন যাপন করা। দুনিয়ায় সুখ সম্পদ, মান ইজ্জত, যশ খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তিই তার কর্ম জীবনের মূল প্রেরণা যোগাবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতি ইমান এনেছে সে প্রত্যেক কাজেই পরকালের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সাফল্য তালাশ করবে। যে কাজ পরকালে তার ব্যর্থতার কারণ হবে বলে তার বিশ্বাস সে কাজের দ্বারা ইহকালের সুখ ও যশের নিশ্চয়তা থাকলেও সে তা ত্যাগ করবেই। সুতরাং একথা প্রমানিত হল যে, মানুষ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে তার জীবনের উদ্দেশ্যও অনুরূপই হয়ে থাকে। মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কারো জীবনের উদ্দেশ্য তার বিশ্বাসের বিপরীত হবে। তাই সর্বশেষ পর্যায়ে বিশ্বাসই চরিত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বিশ্বাসই কর্মের প্রেরণা যোগায়। কর্ম বিশ্বাসেরই ফল, আর বিশ্বাস কর্মেরই মূল।

চরিত্র গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতি

মানুষের চরিত্র শূণ্যে সৃষ্টি হয় না। বাস্তব কর্ম জীবনেই চরিত্রের বিকাশ হয়। নিষ্ক্রীয়তার মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। যে ব্যক্তি বৈরাগ্য জীবন যাপন করে তার চরিত্র গঠিত হবার কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি কথাই বলে না, সে মিথ্যাবাদীও নয়, সত্যবাদীও নয়। কথা বলার মাধ্যমেই তার চরিত্রের একটা অংশ প্রকাশ পায়। দুষ্কর্ম নিশ্চয়ই অসচ্চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু কর্মহীনতা চরিত্রের পরিচায়ক নয়। কতক বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় সে উৎস থেকেই কর্মের ধারা প্রবাহিত হয় আর কর্মের মাধ্যমেই চরিত্র বিকাশ লাভ করে।

উপরোক্ত যুক্তি মেনে নিলে চরিত্র গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতিটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। মানুষ যখনই কোন কিছুকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তখন থেকেই সে উদ্দেশ্যটি তাকে এক বিশেষ কর্মে নিযুক্ত করে। সে যখন উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নিজেকে কর্ম সাধনায় নিয়োগ করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। উদ্দেশ্যটি তার জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য বলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনেক স্বার্থ তাকে ত্যাগ করতে হয়। এ ত্যাগের দ্বারাই তার মধ্যে চরিত্রগুণের সমাবেশ হতে থাকে। প্রত্যেকটি ত্যাগই এক একটি চরিত্রগুণ। এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

এক ব্যক্তি বড় ব্যবসায়ী হওয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করলো। এর স্বাভাবিক পরিনতি হবে এই যে, সে তার সমস্ত সময়, বুদ্ধি ও শ্রমকে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। স্ত্রী, সন্তানাদি ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে স্ফূর্তি করে সময় নষ্ট করতে সে রাজি হবে না। খাওয়া ও শোওয়ার ব্যাপারে তাকে অনেক আরাম ও বিলাস ত্যাগ করতে হবে। সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমান দিয়ে তাকে গ্রাহক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আস্থাভাজন হতে হবে।

এভাবেই বড় ব্যবসায়ী হওয়ার উদ্দেশ্য তার মধ্যে অনেক ক'টি চরিত্রগুণ সৃষ্টি করবে। সে জীবনে কর্তব্য পরায়ণ, পরিশ্রমী, যোগ্য বিশ্বাস ভাজন, সময়নিষ্ঠ ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু বড় ব্যবসায়ী হওয়াই জীবনের লক্ষ্য বলে তার মধ্যে প্রয়োজন বোধে অনেক সমাজ বিরোধী দোষের সমাবেশও ঘটতে পারে। সে যদি দেখতে পায় যে কালোবাজারী, মোনাফাখোরী, ঘুষ দান ইত্যাদি ব্যতীত রাতারাতি বড় ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব নয় তাহলে সে অতন্ত যোগ্যতার সাথে এসবও করবে। এভাবে তার মধ্যে কতক দোষ ও কতক গুণ সৃষ্টি হবে। বড় ব্যবসায়ী হওয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করার সময়েই চরিত্র সম্বন্ধে তার এ জাতীয় ধারণা গড়ে উঠবে।

আর এক ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলো। এ লক্ষ্যটি তার নিকট অনেক প্রকার ত্যাগ দাবী করবে। তাকে আত্মীয় পরিজনের ভালবাসা ও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দেশের আজাদীকে বেশি পছন্দ করতে হবে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও এ কঠিন পথেই সে এগিয়ে চলবে। আবার দেশের আজাদীর প্রয়োজনে যদি মানবতা বিরোধী কাজ করাও অত্যাবশ্যক মনে হয় তাহলে সে পথও সে গ্রহণ করবে। কোন দল বা ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করার দরকার মনে করলে দ্বীধাহীন চিত্তে সে তাও করবে।

কতক লোক যদি সাফল্যের সাথে ডাকাতী করাকেই জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নেয়, তাহলে তাদের মধ্যেও কতক চরিত্রগুণ সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে একত্ববোধ, সরদারের আনুগত্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ইত্যাদি মহান কতক চরিত্রগুণের বিকাশ ঘটবে। তাদের কেউ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলে জীবন দিতে রাজি হবে, কিন্তু সহকর্মী ডাকাত ভাইদেরকে ধরিয়ে দিবে না। তাদের কেউ আক্রান্ত হলে জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

যে ব্যক্তি দেশের উন্নতিকে চরম লক্ষ নির্ধারণ করে সে নিজের দেশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বংশীয় সকল স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রতিবেশি রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেও নিজের দেশের উন্নতি করতে চেষ্টা করবে। ইংরেজ জাতির নেতৃবৃন্দ নিজের দেশের উন্নতির জন্য বহু দেশকে শোষন ও অত্যাচার করেছে। ইংরেজ আপন দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য নাগরিকদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা নিজ দেশের ও জাতির প্রয়োজনে বহু দেশের মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করেছে।

এসব উদাহরণ থেকে প্রমানিত হয় যে, স্বাভাবিক ভাবে চরিত্র সৃষ্টির পদ্ধতিটি কি। মানুষ জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আপ্রান চেষ্টা করতে থাকে। এ চেষ্টার ফলেই এক বিশেষ ধরণের চরিত্র গড়ে উঠে। এ পদ্ধতিটি এ জন্যই স্বাভাবিক যে জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভ করা দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয় এবং সাফল্য লাভের তীব্র আকাংখা থাকা মানুষের স্বভাব।

লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্বই উন্নত চরিত্রের ভিত্তি

উপরের উদাহরণগুলো থেকে দেখা গেল যে, জীবনের উদ্দেশ্য যত বিরাট ও মহান হবে, চারিত্রিক গুণ সে পরিমানেই উন্নত হবে। আর উদ্দেশ্য যত সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট হবে চরিত্র তত জঘন্য হবে যদিও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র পর্যন্ত কতক গুণও সৃষ্টি হতে পারে। বড় ব্যবসায়ী হওয়া নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যেই হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে সততা, কর্তব্যপরায়নতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ হয় বলেই সে উদ্দেশ্য মহান নয়। তাই এ সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়াও স্বাভাবিক। ডাকাতের মধ্যেও অনেক গুণের সমাবেশ হতে পারে। কিন্তু নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের দরুণ সে গুণগুলো শুধু ডাকাত ভ্রাতৃত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ডাকাতদলের বাইরে এরা সবাই মানব সমাজের জন্যের বিভীষিকা। ভারতের নেতা পন্ডিত নেহেরু তার দেশের উন্নতির জন্যে যত ত্যাগই করুন, কিন্তু তার প্রতিবেশী দেশসমূহ ও কাশ্মীরের বেলায় তিনি চরিত্রবান লোকের পরিচয় দেননি। তাঁর চরিত্র ভারতের উন্নতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ নিজের দেশে যত মহান চরিত্রের পরিচয়ই দেন, এদেশে তাঁরা মানব দুশমনীর যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যারা যান, তাদের অনেকেই সে দেশের মানুষের ব্যক্তি চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে আসেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না যে তাদের ব্যক্তি ও জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের গণ্ডীর মধ্যে যে চারিত্রিক গুণ দেখা যায় সেটা সত্যিকারের উন্নত মানের চরিত্র নয়। সত্যিকারের উন্নত মানের চরিত্র সর্বত্রই এক ভাবেই উন্নত বলে পরিচিত হয়। কিন্তু ডাকাতদল যেমন দলীয় গণ্ডীর মধ্যে চরিত্রবান হলেও দলের বাইরে মানবতার দুশমন, তেমনি ঐসব দেশের দায়িত্বশীলরা নিজের দেশে এক রূপ চরিত্রের পরিচয় দেয়, কিন্তু দেশের বাইরে তাদের চরিত্রের মান সম্পূর্ণ পৃথক। ডাকাতের মধ্যে বহু চারিত্রিক গুণের বিকাশ দেখে যেমন তাদের জীবনাদর্শ ও উদ্দেশ্যকে গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করা মারাত্মক হবে, তেমনি ওসব জাতির আদর্শ লক্ষ্যকে অনুসরণ করে যারা আপন দেশের উন্নতি কামনা করে তারাও ভ্রান্ত পথই অবলম্বন করে। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করে বাহ্যিক চরিত্রটুকু গ্রহণযোগ্য মনে করলে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নত চরিত্রের জন্য উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অপরিহার্য।

বিশ্ব নবীর পদ্ধতি

নবী করিম (সা) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করেছেন এবং দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করাকেই সেই সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও অসত্যের মাপকাঠি কারো ব্যক্তিগত, বংশগত, দলগত বা জাতিগত স্বার্থ দ্বারা রচিত হবে না। আল্লাহর রচিত জীবন বিধান দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টাই খেলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের দিকেই রাসুলুল্লাহ (সা) আরববাসীকে আহবান জানালেন। তিনি আরব জাতির বা দল বিশেষের স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। তিনি মানবজীবনের লক্ষ্যকে এমন এক মহান স্তরে উন্নীত করলেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উদ্দেশ্য হতেই পারে না।

জীবনের সে মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার উপযোগী কর্মপ্রেরণা লাভ করার জন্য তিনি আরববাসীদের নিকট কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে এমন এক আল্লহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বললেন যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বত্র বিরাজমান, বিধানদাতা এবং কর্মফল প্রদানের চূড়ান্ত মালিক। আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্যকে তিনি মানব জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জগত ও জীবন সম্পর্কে তিনি এমন কতক যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের দিকে মানুষকে আহবান জানালেন যা গ্রহণ করলে সাফল্যের পার্থিব সংকীর্ণ ধারণা থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে।

এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের যে চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তা গ্রহণ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই এক বিশেষ ধারায় চরিত্র গঠিত হয়। তদানিন্তন আরবের চরিত্রহীন সমাজের লোকদের মধ্যে যাঁরা মহানবীর আহবানে সাড়া দিলেন তাঁদের চরিত্র সঠিকরূপে গঠন করার জন্য তিনি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁদেরকে কোন শিক্ষাগারে বসিয়ে বসিয়ে শুধু জ্ঞান দান করেননি, কোন নির্জন কোঠায় শুধু ধ্যানে নিযুক্ত করেননি। সমাজে হৈ চৈ সৃষ্টি করার কাজে তাদের ব্যবহার করেননি। তিনি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে নামিয়ে দিলেন। পানিতে না নামিয়ে সাঁতার শিখানো অসম্ভব। তাই যে ক'জন তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন তাঁদের প্রত্যেককে তিনি মানব সমাজের প্রশস্ত ও উত্তপ্ত কর্মক্ষেত্রে নিক্ষেপ করলেন। তিনি মানুষকে যে পথে আহবান জানাচ্ছিলেন তার অনুসারীদেরকেও সে দাওয়াতের কাজেই নিয়োগ করলেন। ফলে সমাজের আর সব মত ও পথের সাথে তাদের সংগ্রাম শুরু হলো। নবী ও তাঁর সহকর্মীদের জীবনের লক্ষ্যের সাথে যাদের জীবনাদর্শের গরমিল ছিলো, তাদের সাথে কর্মক্ষেত্রে সংগ্রাম অনিবার্য। কারণ জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এক না হলেই বাস্তবক্ষেত্রে সংঘর্ষ বাঁধে।

প্রকৃতপক্ষে এ প্রত্যক্ষ কর্মজীবনেই চরিত্র সৃষ্টি হয়। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে চরম লক্ষ্য স্থির করে যারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তাদের সাথে প্রথমেই আপন নফস বা প্রবৃত্তির লড়াই শুরু হয়ে গেলো। প্রবৃত্তির দাবিকে ঐ লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদেরকে বহু জাগতিক আপাতমধুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয়েছে। এরপর সমাজের স্বার্থের সাথে তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সংঘাত লেগেছে। এক্ষেত্রে তাদের উপর অনেক উৎপীড়ন চললো। এখানেও চরম লক্ষ্যে পৌঁছার তাগিদ তাদেরকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয় সে কর্মপ্রচেষ্টাই উক্ত লক্ষ্যের উপযোগী চরিত্র গঠন করে। ব্যবসায়ী, ডাকাত ও দেশ প্রেমিকরা নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে পরিশ্রম করে এর ফলে ঐসব উদ্দেশ্যের উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়। বিশ্বনবী যে উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে পরিচালিত করেছেন তাঁদের চরিত্র স্বাভাবিক ভাবেই সে উদ্দেশ্যের উপযোগী হিসেবেই তৈরি হতে লাগলো।

ইতিহাসের নযীর

নবী (সা:) আরব জাতির সম্মুখে জীবনের যে মহান লক্ষ্য তুলে ধরলেন তারই ফলে অসভ্য আরববাসীদের মধ্যে এমন এক মহান চারিত্রিক বিপ্লব সাধিত হলো যার নযীর মানবজাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একই দেশে একই সময়ে উচ্চমানের এতগুলো চরিত্রের সমাবেশ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক মহা বিস্ময়। আল্লাহর সন্তুষ্টিই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের কোন সংকীর্ণ স্বার্থ থাকা সম্ভব নয়। ভূগোলের সীমারেখা রক্ত ও বর্ণের পার্থক্য ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদির কোনটাই তাঁদের উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। তাই তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী সর্বত্র একই উন্নতমানের পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ জাতির ন্যায় তাঁদের চরিত্র দেশবাসীর সংগে একরূপ আর বিদেশীদের সাথে অন্যরূপ ছিল না। কারণ তাদের লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য করে তাঁরা কাজ করেছেন। এর চেয়ে মহান কোন লক্ষ্য হতে পারে না বলে তাঁদের চরিত্রের চেয়ে উন্নত কোন চরিত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত

বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা ও মনস্তত্বের দিক দিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আদর্শের উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়। আজ যারা নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার তাঁদের মধ্যে যারা ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংগ্রাম করবেন তাঁদের মধ্যেই ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এ সংগ্রামের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হবে চরিত্রগুণও সেই পরিমানেই কম হবে। যারা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আদর্শকে কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করবে তারা ঐটুকু ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হবে। কিন্তু এটুকু গুণসম্পন্ন লোক সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা পেলে ইসলামী চরিত্রের কোন পরিচয় দিতে সক্ষম হবে না। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম না করার দরুণ ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায় নি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। একমাত্র সে কারণেই তাঁদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের উপযোগী চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের সংগ্রামের দু'টো দিক রয়েছে। একটি প্রত্যক্ষ ও অপরটি পরোক্ষ। এক, তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয়েছে। তাঁদের চরিত্রকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গঠিত করার জন্যে নামায রোযা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু শুধু এটুকু বা এজাতীয় আরো অনেক নফল এবাদত তাঁদের পূর্ণ ট্রেনিঙের জন্য যথেষ্ট ছিল না। নবী করীম (সা:) তাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি) কোরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন, (ইউ আল্লিমুহুমুল কিতাব) কোরআন মোতাবেক বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান দেখিয়েছেন, (ওয়াল হিকমাত) এবং ইসলামের বিপরীত যা কিছু তাঁদের জীবনে দেখেছেন তা থেকে তাদেরকে সংশোধন করে দিয়েছেন (ইউজাক্কীহিম)। প্রত্যক্ষভাবে তাদের চরিত্র গঠনে রাসুল্লুল্লাহ (সা:) এসব পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

দুই, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তাঁদের জীবনে যে সব চরিত্রগুণ সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু প্রত্যক্ষ শিক্ষা দ্বারা পূর্ন হতে পারতো না। ইসলামী আদর্শের বিপরীত শক্তির সাথে লড়াই চলার ফলে তাদের মধ্যে এমন কতক গুণ সৃষ্টি হয়েছিল যা ইসলামী আদর্শকে কায়েম করার জন্য অপরিহার্য ছিল। বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষ থেকে যত বাঁধা ও উৎপীড়ন চলেছে, তা সবই এক একটি অগ্নি পরীক্ষার সৃষ্টি করেছে। যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই লক্ষ্য স্থির করে এ পথে এসেছেন তাদের মধ্যে এর প্রত্যেকটি পরীক্ষাই কতক নতুন চারিত্রিক গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক একটি অগ্নি পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয় তারা এ সংগ্রামের পথ থেকে আপনিই ছিটকে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য যাদের স্থির হয়েছে তারা প্রতিটি পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হতে থাকে।

বাঁধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে যারা এগিয়ে চলে তাদের মধ্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সততা, ত্যাগস্পৃহা, একনিষ্ঠতা এমনকি জীবনদান করার প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। যে পথে এ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের বালাই নেই, সেখানে জীবনদান করা দূরের কথা, সামান্য স্বার্থ ত্যাগেরও কোন ট্রেনিং হয় না।

এজন্যই হিজরতের পূর্বের ও পরের মুসলমানদের চারিত্রিক মান ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে এক সমান ছিল না। বিজয় যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃর্ত্ব ও দায়িত্ব অর্পন করার ব্যাপারে বদর যুদ্ধে যোগদান কারীদেরকে পরবর্তীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংগ্রাম, উৎপীড়ন, নীপিড়ন ও বাধাবিঘ্ন সত্বেও যারা আদর্শকে কায়েম করার জন্য আন্দোলন বা জিহাদ চালিয়েছেন তাঁদের যে চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব ছিল বিজয় যুগে সে সুযোগই ছিল না।

শেষ কথা

বিশ্বনবী মানব চরিত্র গঠনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি। এ পথ বিনা সংগ্রামে সস্তা মুক্তির পথ নয়। এ পথে আরাম বিশ্রাম সবই হারাম হয়ে যায়। ইসলামী আদর্শকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা ও আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ জীবনের উদ্দেশ্য বলে যারা গ্রহণ করে তারাই এপথের পথিক। তাদের চরিত্র এ আন্দোলনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে। চরিত্র গঠনের এ পদ্ধতিটিই একমাত্র বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক। জীবনের এ লক্ষ্যটুকুতে কোনরূপ ভ্রান্তি থাকলেই সে অনুপাতে চরিত্র গঠন পদ্ধতিতে এবং চরিত্র ত্রুটি থেকে যাবে।

বহু দীনদার লোকেরও একামতে দ্বীনের সংগ্রামী পথটুকু বুঝে আসে না। ফলে তাঁরা এমন সব কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে কোন ক্রমেই বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি হয় না। আন্তরিকতার সম্পন্ন মুসলমানদের মধ্যে আজ যে চারিত্রিক বৈষম্য দেখা যায় এর মূল কারণ চরিত্র গঠন পদ্ধতির পার্থক্য। আর এ পার্থক্যের ভিত্তি হলো দ্বীনকে কায়েম করার সংগ্রামী পথ থেকে বিচ্যুতি। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ সংগ্রামী পথই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।

বাংলায় এর সঠিক তরজমা হতে পারে ইসলামী আন্দোলন। আন্দোলনের এ বিপ্লবী পথছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত কিছুই করা হোক এবং যত এখলাসের সাথেই করা হোক তাতে ইসলামের প্রচার নিশ্চয় হবে কিন্তু ইসলামকে কায়েম করা সম্ভব হবে না। একামতে দ্বীন বা ইসলামকে কায়েম করার জন্য ইশায়াতে দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার অত্যাবশ্যক। কিন্তু শুধু প্রচার দ্বারা জিহাদ হয়ে যায় না বলেই দ্বীন কায়েম করার উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয় না।

ইসলামকে পূর্ণরূপে কায়েম করার আন্দোলন ব্যতীত দ্বীনা ইলেমের প্রচার এবং ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলেও ঐরূপ মুজাহেদানা বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি হবে না যে রূপ চরিত্র ইসলামকে কায়েম করার জন্যে আবশ্যক। সুতরাং ইসলামকে যাঁরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চরিত্র গঠন পদ্ধতিই গ্রহণ করা কর্তব্য।

amarboi.org

boipori.com